|প্র|ব|ন্ধ|

# ধিক্কার দিয়ে কাজ নেই

## সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী

প্রাচীন বাংলার আদি নিদর্শন হলো 'চর্যাপদ', তাতে ক্ষোভ, বিক্ষোভ অনেক কিছুই রয়েছে, আছে ধিক্কারও এবং তা অন্য কারোর ওপরে নয়, খোদ বাঙালি, অর্থাৎ বাংলাভাষীর ওপরেই। বক্তা বলছেন যে, ভুসুকু নামে ব্যক্তিটি শেষ পর্যন্ত বাঙালি হয়ে গেছে। কি করে ঘটলো ওই ঘটনা, বক্তার মূল্যায়নে যা নাকি ব্যক্তিটির জন্য অধঃপতন? ঘটলো বিবাদের মধ্য দিয়ে 'আজি ভুসুকু বাঙালি ভইলী/ নিও ঘরণী চন্ডালী লেলী।' অর্থাৎ বাঙালি মহিলাকে (চন্ডালী) ঘরণী হিসাবে নিয়ে ভুসুকু বাঙালি হয়ে গেছে। খুবই দুঃখের কথা। চর্যাপদের রচয়িতারা ছিলেন বৌদ্ধ, কিন্তু বৌদ্ধ হলেও আর্য বটে, তাঁদের পক্ষে অনার্য চন্ডালিনীকে ঘরণী হিসেবে নেওয়াটা অধঃপতন বৈকি।

এটা, এই ধিক্কার জানানোটা, কোনো অস্বাভাবিক ঘটনা নয়। বহিরাগত আর্যরা এদেশের স্থানীয় মানুষদেরকে আর যা যা বলেছে সেই তুলনায় চন্ডালী যৎসামান্যই বটে। কেননা তারা বলেছে পান্ডববর্জিত এই দেশের মানুষেরা হচ্ছে পিশাচ, পাপিষ্ঠ, দস্যু, রাক্ষস, দাস, কুকুর, ব্রাত্য; বলেছে এদের ভাষা নেই, এরা পাখির ভাষায় কথা বলে। খাঁটি আর্যরা অবশ্য বৌদ্ধদেরকেও বাদ দেয়নি, বৌদ্ধ ধর্মব্যবস্থায় ভিক্ষুরা গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি, ওই ভিক্ষু থেকেই ভিক্ষুক শব্দের উৎপত্তি।

আর বাংলা তো ছিল প্রাকৃতজনের ভাষাই, অভিজাতরা চর্চা করতো সংস্কৃতের। রাজা রামমোহন রায় বাংলা ভাষায় বই লিখেছেন, বাংলা গদ্যের প্রথম লেখকদের মধ্যে তিনি একজন, কিন্তু ১৮৩৩ সালে তিনি যে বাংলা ব্যাকরণ লেখেন, তাকে তিনি বাংলা নামে না ডেকে 'গৌড়ীয় ব্যাকরণ' বলেছেন। মাইকেল মধুসূদন দত্তের হৃদয়ভরা অসহ্য মনস্তাপ ছিল মাতৃভাষারূপ জননীকে ভুলে ভিক্ষুকের মতো নানা দেশে ঘুরে বেড়ানো নিয়ে; ঢাকায় বেড়াতে এসে নিজেকে তিনি কেবল বাঙালি নয়, যশুরে বাঙাল বলে অভিহিত করেছিলেন; কিন্তু তাঁকেও দেখি যখন মহাকাব্য লিখবেন বলে অঙ্গীকারবদ্ধ হয়েছেন, তখন বাঙালির নামে ঘোষণা দিচ্ছেন না, বলছেন, গৌড়জনের জন্য লিখবেন, 'রচিব এ মধুচক্র গৌড়জন যাহে। আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি।' রাজাতে ব্যারিস্টারে বিশেষ একটা পার্থক্য থাকে না, এসব ক্ষেত্রে।

বস্তুত অবজ্ঞা অবহেলা করবার তো বটেই, বাঙালিকে ধিক্কার দেবার জন্য লোকের কোনো অভাব হয়নি। সবকালেই পাওয়া গেছে। পাওয়া গেছে ভেতরে যেমন, পাওয়া গেছে বাইরে। বাঙালি অলস, অল্পে সন্তুষ্ট, নিশ্চেষ্টা ভীরু এসব অপবাদ তো হরদমই শোনা যায়। এখন জুটেছে নতুন নাম, বলা হচ্ছে সে দুর্নীতিবাজও। টেক্কা দেয় বিশ্বের সকল দুর্নীতিবাজ দেশকে। সেটা কম কথা নয়। বাইরের লোকে কেন নিন্দা করে, সেটা বোঝা যায়। তাদের কাছে প্রকৃত ভাবমূর্তিটি তুলে ধরা হয়নি, দেবার কাজটা ঘটতে পারতো, দেশে যদি সঠিক নেতৃত্ব থাকতো তাহলেই। কিন্তু সে-নেতৃত্ব পাওয়া যায়নি। যেদিন পাওয়া যাবে সেদিন হয়তো অন্য ভাবমূর্তি তৈরি হবে। আর এই যে বাঙালির কথা এখন বলছি আমরা, তাতে পূর্ববঙ্গের কথাই আসছে প্রধানত। কেননা বর্তমানে বাঙালির সুনাম বদনামের দায়ভার বাংলাদেশের মানুষকেই বহন করতে হয়, পশ্চিমবঙ্গেও প্রচুর বাঙালি আছে, তবে তাদের পরিচয় দিতে এখন তাদের ভারতীয় জাতীয়তার কথা বলা হয়; পশ্চিমবঙ্গ ভারতের অনেক ক'টি রাজ্যের মধ্যে একটি বটে। আর এই যে পূর্ব ও পশ্চিমের আলাদা হয়ে যাওয়া, তার জন্যও বাঙালিকে দায়ী করার রেয়াজ আছে; কিন্তু ইতিহাসের সত্য হলো এই যে, সাতচল্লিশের বাংলা ভাগের জন্য বাঙালিরা দায়ী নয়, দায়ী হচ্ছে উত্তর ভারতীয় নেতৃত্ব।

বাংলাদেশের বাঙালিরা বরঞ্চ একটা বড় কাজ করেছে, পাকিস্তান থেকে বের হয়ে এসেছে এবং একটি নতুন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে ফেলেছে। ঘটনাটা এমনি এমনি ঘটেনি, ভোটের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়নি, তার জন্য প্রাণপণ যুদ্ধ করতে হয়েছে। কেবল পূর্ববঙ্গের নয়, সকল বাঙালির জন্যই সেটা ছিল গৌরবের বিষয়। আশা করা গিয়েছিল যে ঢাকা হবে বাঙালির আশা-আকাঙ্ক্ষা-স্বপ্ন রূপায়ণের কেন্দ্রভূমি। ওই প্রথম বাঙালি তার নিজের জন্য একটি স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছে, তাই তার সম্মান তখন অত্যন্ত উচ্চে। কিন্তু পারেনি, ওই উচ্চতায় সে থাকতে পারেনি, গড়িয়ে নিচে নেমে গেছে।

তবে সে যে ভীরু নয়, তার প্রমাণ তো দিয়েছে সে, একাত্তরের যুদ্ধে। আগেও দিয়েছে। ব্রিটিশ আমলে এবং পাকিস্তানের কালে বাঙালি নানা আন্দোলন করেছে, উনসত্তর সালে পূর্ববঙ্গ একটি গণঅভ্যুত্থান ঘটিয়েছে, তার পরে একাত্তরের ওই যুদ্ধ, এসব প্রমাণ করে না যে ভীরুতার অপবাদ তার প্রাপ্য। সে অলসও নয়। বাঙালি কাজ চায়, কাজ যখন পায় না তখন হতাশ হয়, বাইরের লোকে মনে করে, সে বুঝি কর্মহীন থাকাটা পছন্দ করে। মোটেই নয়, বাংলার কৃষকের মতো শ্রমশীল ও কষ্টসহিষ্ণু মানুষ যেখানে-সেখানে পাওয়া যাবে না। বিদেশে গিয়ে বাঙালি যে শ্রম করে তাও অতুলনীয় বৈকি। কাজের খোঁজে তথাকথিত বেআইনী পথে বাঙালি তরুণ যে সমুদ্র পার হয় কিংবা মরুভূমির নিষেধ মানে না, সেটা কোনো বিলাসের বা আলস্যের ব্যাপার নয়, কষ্টসহিষ্ণুতার প্রমাণ বটে। আর দুর্নীতি? সেটা অল্পসংখ্যক মানুষই করে থাকে কিন্তু তার দায়ভার বহন করতে হয় সমগ্র জনগোষ্ঠীকে।

তবে হ্যাঁ, গড়পড়তা বাঙালি অল্পে সন্তুষ্ট এটা বললে ভুল হবে না। তেমনটা না হলেই ভালো ছিল। কিন্তু এর জন্যও সে নিজে দায়ী নয়; দায়ী তার পরিবেশ ও পরিস্থিতি, এক কথায় বলতে গেলে তার চারপাশের ব্যবস্থা। ওই ব্যবস্থা সে নিজে তৈরি করেনি, তৈরি ব্যবস্থার ভেতর জন্মের পর থেকেই সে আবদ্ধ আছে। ছিন্ন করতে উদ্যোগ নিয়েছে, কিন্তু সফল হয়নি। ব্যবস্থাটা তৈরি করেছে দেশের শাসক শ্রেণী। বাঙালির জন্য শাসক শ্রেণীই হলো সমস্যা, চিরকাল ছিল, এখনো রয়েছে। শাসক শ্রেণীকে বাঙালির শত্রু বললে মিথ্যা বলা হয় না।

এই শ্রেণীটি আগে ছিল বিদেশী। এখন হয়েছে স্বদেশী। কিন্তু স্বদেশী শাসকেরাও বিদেশীদের থেকে ভিন্ন নয়। এরা জনগণের স্বার্থ দেখে না, স্বার্থ দেখে নিজেদের। জনগণের তৈরি সম্পদ লুণ্ঠন করে, জনগণকে শোষণ করে, শাসন করবার ছল করে। এবং ধিক্কার দেয় তাদেরকেই, যাদেরকে তারা দরিদ্র করে রেখেছে। ওই যে গৌরব ও সম্মানের উঁচু জায়গাটিতে বাঙালি উঠেছিল, সেখানে সে যে থাকতে পারেনি, তার দায়দায়িত্ব দেশের সাধারণ মানুষের নয়। অর্জনটা ঘটেছিল সাধারণ মানুষের কারণে, বিসর্জনটা ঘটালো যারা শাসনক্ষমতাকে কুক্ষিগত করে নিয়েছে তারাই। এ ক্ষেত্রে এ দল ও দল বলে কথা নেই, সব দলই আসলে এক দল। সেটি হলো দেশের শাসক শ্রেণী। তাদের কে কখন ক্ষমতায় ওঠে, দেশের জন্য সেটা মোটেই তাৎপর্যপূর্ণ নয়, কেননা জনগণের দিক থেকে বিচার করলে তারা সবাই সমান, এবং তারা মিলেমিশেই দেশের যা যা ক্ষতি করেছে, এখনো করছে।

ধিক্কার যদি দিতে হয় তবে তা প্রাপ্য হবে দেশের শাসকদেরই। কিন্তু ধিক্কারে কাজ হবে না, তারা সিংহাসন ছেড়ে দেবে না, ক্ষমতাকে পৌঁছে দেবে না জনগণের কাছে। তাই যাঁরা ধিক্কার দিচ্ছেন দেশের সেই বিবেকবান

মানুষদের পক্ষে নিজেদেরকে জিজ্ঞাসা করতে হবে ওই যে শাসক শ্রেণী, দেশের দুর্গতির জন্য যারা দায়ী, তাদেরকে নিবৃত্ত এবং স্থানচ্যুত করবার ব্যাপারে তারা কে কি করছেন। খুবই প্রয়োজনীয় জিজ্ঞাসা সেটা।

কিন্তু কেবল ব্যক্তিগত জিজ্ঞাসাতে সীমাবদ্ধ থাকলে কুলাবে না, প্রয়োজন হবে ঐক্যবদ্ধ কাজের। বলার কী অপেক্ষা রাখে যে, ওই কাজটাই সবচেয়ে জরুরি। শাসক শ্রেণী সরবে না, যদি না তাকে সরানো হয়। আর সরালেও আবার ফেরত চলে আসবে, যদি না যে রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক ব্যবস্থার ওপর ভর করে তারা টিকে আছে, এবং নিজেদেরকে ক্রমাগত শক্তিশালী করে তুলছে সেটিকে ভেঙে ফেলা যায়। অত্যাবশ্যকীয় সেই কাজটি সম্পন্ন করবার জন্য যাঁরা ঐক্যবদ্ধ হবেন তাঁদের ভেতর কেবল যে আত্মজিজ্ঞাসা থাকবে তা নয়, প্রয়োজন হবে আরো দুটি গুণের। একটি হচ্ছে দেশপ্রেম, অন্যটি গণতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি। একটি যথেষ্ট নয়, দুটিই দরকার।

দেশপ্রেম পুরনো ব্যাপার, গণতন্ত্রের চেয়েও পুরাতন বটে। গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে বলবার কথা অল্প, কিন্তু দেশপ্রেমের বিষয়ে বহু অভিযোগ অত্যন্ত সঙ্গতভাবেই উত্থাপন করা সম্ভব। ওই বস্তুটির নাম করে অনেক কুকর্ম পৃথিবীতে করা হয়েছে। দেশ জয়, মানুষ হত্যা, জবরদখল সবকিছুই ঘটেছে। হিটলার-মুসোলিনীর মতো দুর্বৃত্তরা দেশপ্রেমের কথা গলা ফাটিয়ে বলতো। লোককে অন্ধ, উত্তেজিত, উন্মাদ করার ব্যাপারে জিনিসটি খুবই কাজে লাগে। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা দেশ বিপন্ন বলে ভিয়েতনাম আক্রমণ করেছিল, এখন ইরাকে মানুষ মারার উৎসব বসিয়েছে। একাত্তরে পাকিস্তানিরা যে বাঙালি নিধনের কাজে নিমজ্জিত হয়েছিল তখন তারাও ভেবেছিল যে অন্যকিছু নয়, আসলে তারা তাদের দেশই রক্ষা করছে।

সবই সত্য। কিন্তু বিপরীতটাও সত্য। হিটলার যখন রাশিয়া দখল করতে গিয়েছিল, তখন তার বিরুদ্ধে যে শক্তি যুদ্ধ করেছে, তা অস্ত্রের নয়, তা দেশপ্রেমেরই। ওইখানেই পরাভব ঘটে আগ্রাসী ও ধ্বংসোন্মাদ দেশপ্রেমের, সে দাঁড়াতে পারে না তেমন দেশপ্রেমের কাছে, যা একাধারে আত্মরক্ষামূলক ও গণতান্ত্রিক। ভিয়েতনামীরা শক্তি হিসাবে কত সামান্য ছিল মহাপরাক্রমশীল আমেরিকার কাছে, কিন্তু তারা তো অনেকটা সেভাবেই হটিয়ে দিয়েছে যুদ্ধবাজ আমেরিকানদের, যেমনভাবে রুশ দেশপ্রেমীরা হটিয়ে দিয়েছিল বলদর্পী হিটলারকে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ক্ষেত্রেও তো পার্থক্যটা পরিষ্কার দেখলাম আমরা, কিভাবে সব দিক দিয়ে সুসজ্জিত ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নব্বই হাজার সৈন্য হার মানলো প্রায় নিরস্ত্র বাঙালি দেশপ্রেমিকদের কাছে। আত্মরক্ষামূলক ও গণতান্ত্রিক দেশপ্রেম হচ্ছে দাঁড়াবার জায়গা; ওইখানে দাঁড়িয়ে যে শক্তির সৃষ্টি সম্ভব তা দখলদার, অন্ধ, নৈতিক জোরবিহীনদের দেশপ্রেম কখনোই অর্জন করতে পারবে না। পারে না।

দেশপ্রেম থেকে জাতীয়তাবাদ আসে। জাতীয়তাবাদের নামে প্রচুর রক্তপাত হয়েছে। বস্তুত পৃথিবীতে ধর্মের দোহাই দিয়ে যত রক্তক্ষয় ঘটেছে, তার পরেই আসবে জাতীয়তাবাদের স্থান। কিন্তু জাতীয়তাবাদ আবার আগ্রাসনের মুখে নিজস্ব সংস্কৃতি, পরিচয়, ঐতিহ্য এবং স্বাভাবিকতাকে রক্ষা করবার জন্য ভরসার ক্ষেত্রও বৈকি। এবং এই জাতীয়তাবাদের প্রধান ভিত্তি ধর্ম নয়; প্রধান ভিত্তি হচ্ছে ভাষা। ফিলিস্তিনিরা প্রবলভাবে জাতীয়তাবাদী, কিন্তু তারা সবাই এক ধর্মের মানুষ নয়, সেখানে মুসলমানদের সঙ্গে খ্রিস্টানরাও রয়েছে, যারা ইজরায়েলের বিরুদ্ধে লড়ছে। অন্যদিকে ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে দেখি যে সেখানে ধর্মকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে কিভাবে দ্বিজাতি তত্ত্বের জন্ম দেওয়া হয়েছিল, যে তত্ত্ব এখন ভেঙে গেছে। কিন্তু রক্ত ও মৃতদেহের বিরাট স্তূপ সে তৈরি করেছিল এবং তার ক্ষতিকর প্রভাব থেকে উপমহাদেশ এখনো যে নিষ্কৃতি পেয়েছে তা নয়। আসলে ভারতবর্ষ কখনোই এক জাতির দেশ ছিল না, এখানে সব সময়েই বহু জাতি বাস করেছে এবং ওই সব জাতিসত্তার ভিত্তি হচ্ছে ভাষা। ভারতে সকল মানুষের ভাষা হিন্দি নয়, হিন্দিকে সকলে গ্রহণ করতে প্রস্তুতও নয় এবং হিন্দিভাষীদের আধিপত্য সকলের ওপর চাপিয়ে দেবার যে চেষ্টা, তা এখন ভারতে বিচ্ছিন্নতাবাদকে শক্তিশালী করে তুলছে।

আসলে এক রাষ্ট্রে অনেক জাতির বসবাস এখন একটা স্পষ্ট সত্য। বাংলাদেশ যে একটি জাতীয়তাবাদী সংগ্রামের ধারাবাহিকতার ভেতর দিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই, তাই বলে এ দেশ যে এক জাতির রাষ্ট্র তা নয়; এখানে বহু ক্ষুদ্র জাতিসত্তা রয়েছে, যাদের মাতৃভাষা বাংলা নয়। জাতীয়তাবাদ ও দেশপ্রেমকে তাই অভিন্ন বলা যাবে না। একটি জাতি যে কেবল এক দেশেই থাকবে তা নয়, যেমন বাঙালি জাতি এখন পৃথিবীর নানা দেশে ছড়িয়ে আছে, ইংরেজ জাতিও একসময় ইংল্যান্ড ছাড়িয়ে বহু দেশে বসতি গেড়েছে এবং স্থানীয় হয়ে গেছে। তবে দেশপ্রেমের ভেতর জাতীয়তাবাদ থাকে, যেমন জাতীয়তাবাদের ভেতরে দেশপ্রেমের অবস্থানটা সামান্য নয়। এই বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন রয়েছে। কিন্তু আপাতত আমরা যা নিয়ে কথা বলছি তা হলো দেশের প্রতি ভালোবাসা, যার অর্থ হচ্ছে দেশের মানুষের প্রতি ভালোবাসা, যে ভালোবাসায় ইতিহাস ঐতিহ্য প্রকৃতি সবকিছুর প্রতিই অনুরাগ রয়েছে। এই দেশপ্রেমের ক্ষেত্রেই বাংলাদেশের পরাক্রমশীল শাসকশ্রেণী মারাত্মকভাবে দুর্বল। এই শ্রেণীর সদস্যদের সবাই ওপরে ওঠার প্রতিযোগিতায় লিপ্ত এবং এটা একটা অব্যর্থ নিয়মের মধ্যেই পড়ে, যে যতটা ওপরে ওঠে তার ভেতরে দেশপ্রেম তত কমে আসে, অর্থাৎ ওপরে উঠবার সিঁড়ি ভাঙবার ক্ষেত্রে দেশপ্রেম একটি বোঝা বটে। অথচ দেশের মূল রাজনৈতিক ধারায় এই শ্রেণীর যে কর্তৃত্ব, সেখানে বড় দুই দল উভয়েই নিজেদেরকে জাতীয়তাবাদী বলে থাকে- আওয়ামী লীগ তো বরাবরই জাতীয়তাবাদী দল, বিএনপিও তার নামের সঙ্গে 'জাতীয়তাবাদী' পরিচয়টি বেশ জুৎসই ভাবেই বিজ্ঞাপিত করে রেখেছে, চিনতে কোনো অসুবিধা নেই।

এরা যে দেশপ্রেমিক জাতীয়তাবাদী নয়, তাতে সন্দেহ করবে কোন বোকা। আর দেশপ্রেমিক যে নয় তার একটি বড় নিদর্শন হচ্ছে এটা যে, এরা কেউই গণতান্ত্রিক নয়। ক্ষমতা পাওয়া মাত্র স্বৈরাচারী হয়ে ওঠে এবং ক্ষমতা যে তারা চায় তার পেছনেও অভিসন্ধি থাকে স্বৈরাচারী হবার। পরমতসহিষ্ণুতা একেবারেই নেই। গণতান্ত্রিকতার শর্ত হচ্ছে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ; তাতে আমাদের জাতীয়তাবাদীরা একেবারেই বিশ্বাস করে না। গণতন্ত্র চায় মানুষে মানুষে অধিকার ও সুযোগের সাম্য প্রতিষ্ঠা করতে; সেই সাম্যের ব্যাপারে এরা মোটেই উৎসাহী নয়। এই প্রসঙ্গে বলা দরকার যে, পুঁজিবাদ কথায় কথায় গণতন্ত্রের কথা বলে ঠিকই কিন্তু পুঁজিবাদ চরিত্রগতভাবেই গণতন্ত্রবিরোধী। কেননা পুঁজিবাদ মানুষে মানুষে বৈষম্য সৃষ্টি করে এবং ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির বিচ্ছিন্নতা বাড়িয়ে দেয়, যে বিচ্ছিন্নতা গণতন্ত্রের বিরোধী। কারণ গণতন্ত্র চায় মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করতে, ঐক্যের ভেতর দিয়ে বিচ্ছিন্নতা দূর করতে। আমাদের জাতীয়তাবাদী শাসকেরা মনেপ্রাণে পুঁজিবাদে দীক্ষিত; এবং আচরণেও তারা পুঁজিবাদী। পুঁজিবাদের একটা বিশ্বব্যবস্থাপনা রয়েছে, যে ব্যবস্থাপনার পরিচালনা ও সংরক্ষণ-দায়িত্ব সাম্রাজ্যবাদের হাতে। বাংলাদেশের শাসক শ্রেণী সাম্রাজ্যবাদবিরোধী হবে এমনটা কল্পনা করাও কঠিন। তারা ভয়ঙ্করভাবে সাম্রাজ্যবাদ-সমর্থক। দুর্বল দেশের পুঁজিবাদীদের পক্ষে তেমনটা না হয়ে কোনো উপায় নেই। যারা সাম্রাজ্যবাদের অনুচর, যারা মনে করে যে তাদের ক্ষমতায় যাওয়া ও সেখানে টিকে থাকা জনগণের সমর্থনের ওপর নির্ভর করে না, করে সাম্রাজ্যবাদের সমর্থন পাওয়ার ওপর, তাদের পক্ষে আর যা-ই হোক দেশপ্রেমিক হওয়া সম্ভবপর নয়। এরা আসলে মীরজাফর ও জগৎশেঠদের বংশধর; স্থানীয় বটে কিন্তু যোগাযোগ বিদেশীদের সঙ্গে।

সব দেশেই উন্নতির কথা শোনা যায়, আমাদের দেশও ব্যতিক্রম নয়। কিন্তু উন্নতি মানে তো মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি নয়, হওয়া উচিত সমগ্র জনগণের জীবনযাত্রার মানে উন্নতি। তেমন উন্নতির কথাও বলা হয়। সরকার বলে, বেসরকারি সাহায্য সংস্থা এনজিওরা বলে। উন্নয়নের চেষ্টা করে বলে তো মনে হয় না। কিন্তু উন্নতি হয় সামান্য এবং যেটুকু হয় তাও পুঁজিবাদী ধরনের, বিচ্ছিন্নভাবে, এখানে সেখানে, সার্বিকভাবে নয়; এবং তাতে বৈষম্য কমে না, বরঞ্চ বৃদ্ধি পায়। এনজিও'রা বাইরে থেকে যে টাকা আনে, তার বেশির ভাগ চলে যায় ওই সব প্রতিষ্ঠানের স্থানীয় আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থাপকদের এবং যারা সাহায্য দেয় সেই বিদেশী কর্মকর্তাদের পকেটে। এনজিও'রা কেউ কেউ সুদের ব্যবসা করে, কেউ বা সরাসরি ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে; সবই পুঁজিবাদী পদ্ধতিতে ঘটে। তারা দাবি করে যে ভিক্ষুকদেরকে স্বাবলম্বী করছে, কিন্তু বলতে পারে না যে, তার ফলে দেশ থেকে ভিক্ষাবৃত্তি উঠে যাচ্ছে। বলতে পারবেও না, কেননা তারা নিজেরাই ভিক্ষুক, এবং যে শাসক শ্রেণীর মদদে তারা কাজ করে সেই শ্রেণী নিজেও পরমুখাপেক্ষী- সাম্রাজ্যবাদীদের। এনজিও'রা জ্ঞাতে অজ্ঞাতে সাম্রাজ্যবাদের দ্বিতীয় ফ্রন্ট হিসেবেই কর্মরত; তাদের লক্ষ্য পুঁজিবাদী মানুষ তৈরি, অর্থাৎ মানুষকে বিচ্ছিন্ন, স্বার্থপর ও ভোগবাদী করে তোলা। তাদেরকে উদয়াস্ত ব্যস্ত রাখে, সময় ও সুযোগ দেয় না সমষ্টিগত চিন্তার। উদ্দেশ্য, এমন অবস্থা তৈরি করা, যাতে তারা বিপ্লবী না হয়।

দেশে পোশাক শিল্প গড়ে উঠেছে। কিন্তু তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কাপড়ের কল যে গড়ে উঠবে, তেমনটা ঘটেনি। তার বড় কারণ টাকাওয়ালারা দ্রুত মুনাফা লাভে বিশ্বাসী, বিনিয়োগে তাদের আগ্রহ নেই; সেলাইয়ের দোকান বোঝে, কলকারখানা বোঝে না।

পোশাক শিল্পে মেয়েরা কাজ করছে। তা থেকে এটা ধারণা করবার কোনো কারণ নেই যে, মালিকেরা মেয়েদের অবস্থার উন্নতি চায়। আসল ঘটনা হলো এই যে, নারী শ্রম, পুরুষ শ্রমের তুলনায় সস্তা। মেয়েরা ছেলেদের চেয়ে কাজে মনোযোগ দেয় বেশি। কারণ তারা মনে করে, কাজটা তাদের জন্য একটা সুযোগ, গৃহে ভৃত্যের মতো থাকার তুলনায়। কিন্তু এই সস্তা শ্রমিকেরা যে নিজ নিজ জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়টা বিক্রি করে দিচ্ছে মুনাফাকারী মালিকদের কাছে, এবং যখন কর্মক্ষমতা তখনকার মতো থাকবে না তখন যে তাদেরকে নিঃস্ব অবস্থায় ফিরতে হবে সেই গৃহেই, সেই সত্যটা তো মর্মান্তিক।

ধিক্কার নয়, প্রয়োজন তাই জিজ্ঞাসার। কারণ কি? কেন ঘটছে ওইসব ঘটনা, যার জন্য বাঙালি আজ এভাবে অপমানিত, লাঞ্ছিত ও ম্রিয়মাণ? মূল কারণ দেশের শাসক শ্রেণী। তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ আবশ্যক। কারা নেবে এই ব্যবস্থা? নেবে তাঁরা যাঁদের ভেতর দেশপ্রেম ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ আছে, রয়েছে সাম্রাজ্যবাদ ও পুঁজিবাদ বিরোধিতা।

এই কাজে তাদের ভূমিকাটা কী, যারা উদারনৈতিক? না, তাদের ভূমিকা মোটেই ইতিবাচক নয়। এমনকি যখন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বলে তখনও তারা পুঁজিবাদকে শত্রু হিসেবে দেখতে পায় না। মনে করে, সাম্রাজ্যবাদ আলাদা কিছু। উদারনীতিকদের সবচেয়ে বড় অসুবিধা ওইটাই, তারা বিষয়ের গভীরে যেতে চায় না, ওপরটা দেখে, ওপর থেকে দেখে, ভেতরে কী আছে সেটা অনুসন্ধানে অনীহা প্রকাশ করে, হয়তো বা ভয়ই পায়, পাছে বড় একটা দায়িত্ব এসে পড়ে কাঁধে। দায়িত্বটা হচ্ছে, যে-আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা ওই শাসক শ্রেণীকে রক্ষা করছে তাকে ভেঙে ফেলা, সকল মানুষকে মুক্ত করা। উদারনীতিকেরা এ দায়িত্ব নেবার কথা ভাবতেও ভয় পাবে, কেননা তাদের পক্ষে তো কিছুতেই চরমপন্থী হওয়া সম্ভব নয়। তাহলে তো তারা একেবারেই পতিত হয়ে যাবে, উদারনীতিকই থাকবে না। সেটা যে কতবড় বিপদ অন্যরা না, জানলেও তারা নিজেরা ঠিকই জানে।

অথচ উদারনীতিকেরাই ধিক্কার দেয় সবচেয়ে বেশি। সেটাও স্বাভাবিক। ধিক্কার দিয়ে বোঝাতে চায় যে তারা নয়, দায়ী অন্যরা। এই যে দায়িত্ব চিহ্নিত না করা, শত্রুকে না জানা, এর দ্বারা পরিষ্কারভাবে প্রমাণিত হয় যে, এরা শাসক শ্রেণীর পক্ষের লোক। শাসক শ্রেণী টিকে থাকুক, এরা সেটাই চায়। এইসব ভদ্রলোকেরা কখনো কখনো এ দলে ও দলে বিভক্ত হয়, কিন্তু কখনোই পুঁজিবাদকে ছাড়ে না। পুঁজিবাদের বিকল্প যে কিছু থাকতে পারে সেটা মানে না, যেটা চায় তা হলো পুঁজিবাদের সংশোধন ও গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি, তাকে একটি মানবিক চেহারা দেওয়া।

এককালে এদের একাংশ রক্ষীবাহিনীর সমর্থক ছিল। তখন যুক্তি ছিল এই যে ওই বাহিনী চরমপন্থীদের দমন করছে। উদারনীতিকেরা চরমপন্থীদের জাতশত্রু। অন্তত মন-মানসিকতায়। কিন্তু রক্ষীবাহিনী যে চরম কাজ করছিল, তাদের কান্ড যে হত্যাকান্ড হয়ে দাঁড়িয়েছিল, এবং হত্যা দিয়ে যে প্রতিশোধই শুধু নেওয়া যায়, হত্যা থামানো যায় না এটা তাঁরা বুঝতে চায়নি। সম্প্রতি র‍্যাব যে ধরনের কাজ করছে তাকেও সমর্থন করতে দেখা গেছে, উদারনীতিকদের মহলবিশেষকে। যুক্তি একই, সন্ত্রাসীদেরকে দমন করা হচ্ছে। কিন্তু ওভাবে কাজ হয় না, সন্ত্রাসের লালনভূমিকে নষ্ট না করতে পারলে সন্ত্রাস যে দূর হবার নয় এই 'চরমপন্থী' উপলব্ধির দিকে তারা এগোয় না। র‍্যাবের উদারনৈতিক সমর্থকরা এখন কিছুটা বিব্রত হয়েছে এটা দেখে যে, সন্ত্রাসদমনকারী ঐ বাহিনীর সদস্যরা ইতিমধ্যেই ঘুষ নিতে শুরু করেছে। কেউ কেউ ডাকাতি করতে গিয়ে ধরা পড়েছে। র‍্যাবের ওপর নজরদারি করার জন্য এখন গোয়েন্দা লাগানো হবে। কিন্তু তারপর? গোয়েন্দাদের ওপর নজরদারি করবে কে? ডাকাতি যদি উন্নতি লাভের প্রকৃষ্ট পন্থা হয়, তবে কার সাধ্য ডাকাত-প্রজনন রোধ করে।

উদারনীতিকেরা কমিউনিস্টদেরকে বলতো চরমপন্থী। বলতো এ দেশে চরমপন্থা চলবে না। অথচ চরম দারিদ্র্য, বৈষম্য, নিষ্পেষণ সবকিছুই সমানে চলছিল, এখন যেমন চলছে। উদারনীতিকেরা সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় চরমপন্থাকে মেনে নিতে অসমর্থ হয় না; হয়তো বিক্ষোভ প্রকাশ করে, সমালোচনাতেও মুখর হয়, কিন্তু ব্যবস্থার মৌলিক পরিবর্তন চায় না। কেননা সেটা হবে চরমপন্থা।

ইতিমধ্যে ভিন্ন এক প্রকার চরমপন্থার অভ্যুদয় ঘটেছে। সেটা হচ্ছে মৌলবাদী শক্তি, বলা যায় ধর্মীয় ফ্যাসিবাদী বাহিনী। এরা জঙ্গি হয়ে উঠছে। এই অভ্যুদয়ও কিন্তু দেশের ওই যে সামাজিক-রাজনৈতিক ব্যবস্থাপনা, তারই প্রতিফল। পুঁজিবাদই মৌলবাদের জন্ম দেয়। প্রথমে দিয়েছে প্রশ্রয় দানের মাধ্যমে, সকল সময়েই দিয়ে আসছে দারিদ্র্য ও বৈষম্য সৃষ্টির ভেতর দিয়ে। গরিব মানুষ ভরসা পায় না। বিচারের আশা দেখে না, চতুর্দিকে অনুভব করে হতাশার অন্ধকার; এ রকম অবস্থায় তারা ধর্মের কাছেই যায় আশ্রয় ও ভরসার জন্য। অর্থনৈতিক ও সামাজিক বৈষম্য তাদের ভেতরে যে বিক্ষোভ তৈরি করে সেটা গণতান্ত্রিক উপায়ে প্রকাশের পথ খুঁজে না পেয়ে জঙ্গি ফ্যাসিবাদী পথের সন্ধান করে। গরিব মানুষদের জন্য মাদ্রাসা শিক্ষার যে বিপুল আয়োজন করা হয়েছে সে শিক্ষা ধর্মের সংস্থান করে না, ওদিকে অভিমান তৈরি করে শিক্ষার; এই মানুষেরা যদি মৌলবাদী হয়, তাহলে বিস্ময়ের কারণ থাকে না। শাসক শ্রেণী নিজেও বিচ্ছিন্ন থাকে দেশ থেকে, পরস্পর থেকেও, তারাও আশ্রয় চায় ধর্মের। ধর্ম তাদের জন্য আত্মপরিচয়ের বাহন হয়। ধর্মকে তারা ব্যবহার করে রাজনীতিতে। মানুষকে শান্ত রাখার এবং ভোট পাবার ক্ষেত্রে ধর্ম সহায়ক হয়। শাসক শ্রেণীর লোকেরা ধার্মিক সেজে নিজেদের ভয়ঙ্কর চেহারাটাকে আড়াল করতে চায়। একালে যে অপরাধ করছে, সেটা তারা জানে; তাই পরকালের ভয় তাদেরকে ধর্মের দিকে ঠেল দেয়। ধর্ম তাদের কাছে সামাজিকতার তো বটেই, উৎসবেরও উপলক্ষ হয়ে দাঁড়ায়। এসব কর্মকান্ডের সবটাই ঘটে পুঁজিবাদী ব্যবস্থাপনার ভেতরে ও কারণে। কিন্তু উদারনীতিকেরা এই ব্যাপারটা বুঝতে চান না। তারা মূল কারণে যান না; অন্ধকারকে দূর করতে চান বাক্যের লাঠির সাহায্যে তাকে প্রহার করে, তাতে অন্ধকার দূর হয় না, অপচয় ঘটে শ্রম ও সময়ের।

সাবেক মস্কোপন্থী কমিউনিস্টদের কাউকে কাউকে দেখলে উদারনীতির কার্যকারিতা বোঝা যায়। এক সময়ে এঁরা নিজেদেরকে কমিউনিস্ট ভাবতেন; তখন ভ্রমণ, চিকিৎসা, ব্যবসা, বীরত্বপূর্ণ ভঙ্গি সংগ্রহ, অনেক কিছুর ব্যাপারেই সোভিয়েট ইউনিয়নের কাছ থেকে সাহায্য পেতেন ও নিতেন। এখন ভাব করেন ওই সংস্রবটা ভ্রান্ত ছিল, কেবল ভ্রান্ত নয় সংগ্রহের কারণে বুঝি-বা গায়ে ময়লা লেগেছিল, তাই এককালের সহায়তাদানকারীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ পরের কথা, তাদেরকে ধিক্কার দিতে পারলে সন্তোষ অনুভব করেন। বুঝতে চান না যে সোভিয়েট ইউনিয়নের পতন হয়েছে ঠিকই, কিন্তু তার অর্জনটা মোটেই সামান্য নয়। রুশ বিপ্লবের আগের পৃথিবী আর পরের পৃথিবী যে এক নয়, এটা অনেক অসমাজতন্ত্রীও কিন্তু স্বীকার করেন। একাত্তরে সোভিয়েট ইউনিয়ন থাকাতে যে আমাদের সুবিধা হয়েছে, সেটা তো ওই রকম অনেক ঘটনার মতো একটি ঘটনা মাত্র। মার্কিনিদের ইরাক দখল এবং সারা বিশ্বের ওপর পুঁজিবাদী আধিপত্য যে সোভিয়েট ইউনিয়নের পতনের অনুষঙ্গ, তা অস্বীকার করবে কে? আর পতন যে ঘটেছে সেও যে অনেকাংশে ভেতরে পুঁজিবাদী ধ্যানধারণার বিস্তারের কারণেই, সেটাও খেয়াল করা হয়নি। পুঁজিবাদী ধ্যানধারণার অন্তর্ঘাতের পেছনে পুঁজিবাদীদের প্রবল প্রচারমাধ্যমের যে ভূমিকা, তাকেও খাটো করে দেখবার কোনো উপায় নেই।

উদারনীতিতে দীক্ষিত সাবেক মস্কোপন্থীদের ভাবভঙ্গি দেখলে মনে হয়, রুশ দেশের মানুষেরা খুবই ভুল করেছিল নিজেদের দেশে একটি বিপ্লব ঘটিয়ে। ভুল নয়, অন্যায়ও বলা চলে; কেননা তারা যদি ওই বিপ্লব না ঘটাতো, তাহলে তো এসব মস্কোপন্থীদের পক্ষে মস্কোপন্থী হবার বিড়ম্বনাটা সহ্য করতে হতো না। এখন তারা সোভিয়েট ইউনিয়নের যত সমালোচনা করেন ততটা পুঁজিবাদী মহলের সর্বত্র যে শোনা যায়, তা নয়। নব্য উদারনীতিকেরা সাবেকীদের ছাড়িয়ে যাবে, সেটাকে বোধ করি অস্বাভাবিকও বলা যায় না।

উদারনীতিকেরা সিভিল সোসাইটির ভূমিকাকে বেশ গুরুত্ব দেন। বেচারাদের এই কাজটা বেশ করুণা-উদ্দীপক। কেননা তারা ভুলে যান যে ওই সিভিল সোসাইটি আসলে শাসক শ্রেণীরই বন্ধু। জনগণের পক্ষে সিভিল সোসাইটি যখন কথা বলে তখন জনগণের স্বার্থে নয়, কথা বলে শাসকদের স্বার্থেই। তারা হচ্ছে শাসক শ্রেণীর অবৈতনিক পরামর্শদাতা। পুঁজিবাদে বিশ্বাসী।

দেশের অবস্থা খারাপ হচ্ছে। আগামীতে কি ঘটতে যাচ্ছে আমরা জানি না, যেমন জানতাম না একাত্তর সালের মার্চ মাসে। ওই মাসের শেষ দিকে যা ঘটলো তা ছিল আমাদের কল্পনার বাইরে। তার জন্য আমাদের কোনো পূর্বপ্রস্তুতি ছিল না। আগামীতেও পূর্বপ্রস্তুতিহীন দুর্গতির মধ্যে পড়বো কি না, জানি না। তবে এটা তো জানা কথা যে, প্রতিরোধের চেষ্টা না করলে দুর্যোগের হাত থেকে মুক্তি পাবার কোনো উপায় নেই। ওই কাজটা আর যেভাবেই হোক ধিক্কার দানের ভেতর দিয়ে ঘটবে না, কাজের কাজ দরকার হবে। এবং সে কাজটা অন্য কিছুর নয়, সমাজ-কাঠামোতে মৌলিক পরিবর্তন আনবার সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা। মৌলিক পরিবর্তন আসেনি বলেই বর্তমান শাসক শ্রেণী সেই কাজই করে চলেছে যে-কাজ আগের শাসকেরা করেছে এবং দেশে প্রকৃত উন্নতি বলতে যা বোঝায় তা ঘটছে না।